অনর্থনীতি : অর্থনীতি কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়[1]

মৈত্রীশ ঘটক

অনর্থনীতির অবতরণিকা

অর্থনীতি বিষয়টি মাঝে মাঝে বড়ই একঘেয়ে লাগে । অথচ পেশার তাগিদে দিনরাত তার চর্চা করতে হয় । এমনিতেই তো বিষয়টিকে অনেকে বলেন "বিষণ্ন বিজ্ঞান" (dismal science) : সীমিত সম্পদ, সীমিতসংখ্যক বিকল্প, তার মধ্যে একটিকে বাছলে অন্যটিকে ছাড়তে হয়। সব পেয়েছির দেশে আর যাই হোক অর্থনীতি বিষয়টির খুব একটা ভবিষ্যৎ নেই ।

এদিকে বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল, দেশের অর্থনীতি বেহাল । সবাই পরিবর্তন চাইছেন কিন্তু সে আমেরিকাই হোক বা পশ্চিমবঙ্গ, পরিবর্তন হলে বলছেন যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাইনা । বামপন্থীরা নয়া-উদারবাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান দিয়ে দুই দশক ধরে গর্জেই যাচ্ছেন, বর্ষাতে পারছেননা। ধনতন্ত্রের সংকট হলে তাঁরা উল্লসিত হয়ে বলেন, হবেই তো এরকম, সেই কবে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই বলে আসছি, আর সমাজতন্ত্রের সংকটের কথা তুললে দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টান। আর নয়া-উদারবাদীরা মিশ্র-অর্থনীতির এবং লাইসেন্স-কোটা-পারমিট রাজের আদি-সনাতনবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত অর্থনীতির মুক্তধারায় জীর্ণ-পুরাতন সব ভাসিয়ে জ্বলজ্বলে ভারত বানাতে চান । মুশকিল হল, অনেক হাড় জিরজিরে গরিব লোক পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সিনটা নষ্ট করে দিচ্ছে, এমনি করলে টাইমস বা নিউসউয়িকের প্রচ্ছদে ঝকঝকে ছবি ছাপবে? তাদের একটু সবুর কর, টুপটাপ ঝরে পড়বে টুপুর-টাপুর অর্থনীতির (trickle down economics) যাদুমন্ত্রে উন্নয়নের প্রসাদ বললেও সরছেনা । চেষ্টা চলছে দারিদ্র্য রেখা নামিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের ভেলকি দিয়ে যদি সমস্যার সমাধান করা যায়, তা না হলে ফোটো-শপিঙের শরণ নিতে হবে ।

[1] শারদীয় অনুষ্টুপ, ২০১২।

রাজনীতির অবস্থাও তথৈবচ। এক দল দাস ক্যাপিটাল ছেড়ে ক্যাপিটালের দাস হতে গিয়ে ক্ষমতাচ্যুত। আবার বিরোধী দল সরকারে এসেও বিরোধের রাজনীতির পার্ট আউড়ে যাচ্ছেন। ওদিকে সুশীল সমাজের আকুল প্রাণের ব্যাকুল ব্যথা সামাল দিতে গেলে উন্নয়নের কোন প্রকল্পই বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। এঁদের কথা ভেবেই বোধহয় সুকুমার রায় লিখেছিলেন

"মাঠ পারে ঘাট পারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান ঘ্যান আবদারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না
কি যে চাই তাও চাই বোঝা কিছু যায়না। "

তাঁরা বলছেন উন্নয়ন হল বিষ, নিজস্ব জীবনে যন্ত্রসভ্যতা ও বাজারি অর্থনীতির সমস্ত সুযোগ ও সম্ভার নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে বলছেন, আমাকে নয়, আমার বাণীকে অনুসরণ কর। আর আমার মত গবেষকেরা? দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করা বড্ডো পরিশ্রম, একটু হাত পা ছড়িয়ে আরামে না থাকলে কি আর মাথা খেলে? তা ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হল নিজের দারিদ্র্য দূর করা! দরিদ্রদের থেকে যতদূরে যাওয়া সম্ভব গিয়ে - সে দেশেই হোক বা বিদেশে - পাঁচতারা হোটেলে সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছি, নিজেদের যুক্তি-তত্ত্ব-তথ্যের জালে পরস্পরকে জড়িয়ে ফেলে কাবু করছি, তারপর ক্লান্ত হয়ে "শেকহ্যান্ড আর দাদা বল, সব শোধবোধ ঘরে চল" বলে সান্ধ্যভোজনে যাচ্ছি। বিষয়বস্তুর থেকে একটু দূরত্ব বজায় না রাখলে কি আর নিরপেক্ষ গবেষণা হয়? খুবই গোলমেলে সময়। কারোর ওপরই ঠিক ভরসা করা যাচ্ছেনা।

তাই ভাবলাম অন্য, আরেকটু মনোগ্রাহী কিছু নিয়ে লিখি। এই যেমন জীবনের মানে, বা অস্তিত্বের সঙ্কট, বা বিপন্ন বিস্ময়। উৎসাহের চোটে প্রবন্ধের নামও

দিয়ে দিলাম একটা - অর্থনীতি নয়, অর্থাৎ অনর্থনীতি । মূলধারার অর্থনীতি কে অনেকে অর্থহীন মনে করেন, তাই নিজের একটা প্রতিবাদী ভাবমূর্তি কল্পনা করে বেশ আত্মপ্রসাদও হল। এদিকে সম্পাদক মশাই শুনে মহা উৎসাহে বললেন বাঃ বাঃ, বেড়ে নাম দিয়েছো, ফ্রিকোনমিক্সের বাংলা তো?[i] কিম্ভূত বা বিটকেল অর্থনীতি নিয়ে লেখার সাধ বা সাধ্য কোনটাই নেই, সহজ সরল ডালভাত অর্থনীতি নিয়েই হিমশিম খাই। আর অনুকরণ পরিহার করা হল গবেষকজীবনের ব্রত । কিন্তু অনর্থর মানে তো তুলকালামও বটে, তাই সম্পাদক মশাইকে দোষও দেওয়া যায়না । একটু দমেই গেলাম । শ্রীহরিচরণের শরণ নিলাম, জানতে পারলাম অনর্থের আরেক অর্থ হল অর্থ নেই যার, মানে দরিদ্র ।[ii] ভাবলাম ভালই তো, উন্নয়নের অর্থনীতি তো দরিদ্র-দের নিয়েই আর সেইটি আমার গবেষণার অন্যতম বিষয় (এবং আমার মাস্টারমশাই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় “পুওর ইকনমিক্স” বলে সম্প্রতি একটা জনপ্রিয় বইও লিখেছেন)। আবার রসসম্রাট শিবরামের প্রতি পান-পাত্র উত্থিত করে সম্মান জানানও হল। লিখতে বসে দেখি ও হরি, যাই লিখতে শুরু করি চারপাশ দিয়ে হযবরলর সেই হাড়জ্বালানো হাসিওয়ালা বেড়ালটার মত অর্থনীতি উঁকি মারছে । সূত্রধরের যেমন অরণ্যে বৃক্ষের শোভা দেখে তক্তা, হাতুড়ি, এবং পেরেকের কথাই মনে পড়ে, আমারও সেই অবস্থা , যদিও নিজেকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে যতই হোক স্বয়ং মার্ক্স বলেছিলেন অর্থনীতিই হল সব কিছুর ভিত্তি ।

ছোট অর্থনীতি, বড় অর্থনীতি, ও অনর্থনীতি

প্রশ্ন হল, কোন সে অর্থনীতি, কি তার অর্থ, কি তার নীতি? অর্থনীতির পাঠ্যবই বলে এক অর্থনীতি আছে, তাকে আমরা ছোট অর্থনীতি (microeconomics) বলতে পারি যার মূলে আছে কোন ব্যক্তি কি ভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়, এবং কোন একটি বাজারে কিভাবে সেই সিদ্ধান্ত গুলোর মধ্যে সমন্বয় হয় তার বিশ্লেষণ । কৃষক-শ্রমিক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-চাকুরীজীবী এঁদের নানা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ এই সব ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা,

ছোট ছোট দুঃখকথা হল তার আলোচ্য বিষয় । আবার আরেক অর্থনীতি আছে, তাকে আমরা বড় অর্থনীতি (macroeconomics) বলতে পারি যার মূলে আছে সমষ্টি । নানা বাজারের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, জাতীয় আয় ও তার বৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বেকারির হার, বাজেটের ঘাটতি, সুদের হার, মুদ্রাস্ফীতি, এই সব নিয়ে তার চর্চা । মুশকিল হল, বিশেষজ্ঞদের হাতে পড়লে যেকোন বিষয়ের সহজ কথাও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে । আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে অঙ্ক, পরিসংখ্যান, গুরুগম্ভীর পরিভাষার চাপে আমাদেরই মাঝেমাঝে নাভিশ্বাস ওঠে । যার এই সব কচকচিতে কোন উৎসাহ নেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কিছু কি অর্থনীতি বিষয়টিতে আছে ? পাঠ্যবই আর গবেষণা পত্রের বাইরে, "শেয়ার বাজার ডিগবাজি খাচ্ছে, বিদেশি মুদ্রার হার ডনবৈঠক দিচ্ছে" এই ধরণের সংবাদের বাইরে, আছে কি অন্য কোন অর্থনীতি ? আছে অনর্থনীতি, বা, জীবনমুখী অর্থনীতি । অর্থনীতি কিন্তু প্রথাগত অর্থনীতি নয় । আমাদের চার পাশে নানা যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে সমস্যা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল নাগরিক হিসেবে আমরা প্রায় প্রতিদিন যেগুলোর মুখোমুখি হই, সংবাদমাধ্যমে আলোচনা হয়, নিজেদের মধ্যে কথাতেও উঠে আসে সেগুলো নিয়ে ভাবতে অর্থনীতি বিষয়টির কিছু যুক্তি আমাদের কাজে লাগতে পারে, মতের মিল হোক আর না হোক । বাস ভাড়া বৃদ্ধি থেকে বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথার (জাতপাত, লিঙ্গ বা বর্ণ বৈষম্য) ওপর বাজারের প্রভাব, অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবিরা বামপন্থী হন কেন, শিশু শ্রম থেকে ভোট কেনা বেচা, মাদকদ্রব্যের কেনাবেচা কি বৈধ করা উচিৎ এইরকম অজস্র আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ে অর্থনীতির কিছু যুক্তি প্রয়োগ করলে কোন অদৃশ্য নকশা বেরতে পারে কি? বলে রাখা ভালো, এইসব নিয়ে খানিক হালকা গালগল্প করাই আমার উদ্দেশ্য । শুরুতেই বললাম না, পেশার তাগিদে দিনরাত অর্থনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা আর চর্চা করে পূজনীয় পরশুরামের ভাষায়, একটু ভোচকানি লেগে গেছে । [iii] তবে মাঝে মাঝে যদি অনর্থনীতির প্রাঙ্গনে অর্থনীতি ঢুকে পড়ে, লীলা

মজুমদারের সেই মনটা ভালো কিন্তু মরে গিয়েও পকেটমারি ছাড়তে না পারা ভুতটির মত জিভ কেটে বলতে হবে ““কি করব? ওব্যেস্!”

ভালো বাজার, মন্দ বাজার

বাজার কথাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা আঁশটে গন্ধ আছে। মাছের বাজার, খোলা বাজার, বাজারে, কালোবাজার, চোরাবাজার, বাজার গরম, বাজার দর, বাজারে কাটা, বাজার খারাপ এই সব শব্দগুলো শুনলে আজও মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে ভিড়, গন্ধ, নোংরা, কাদা-জল মাখা মফঃস্বলের বাজারদর্শনের প্রথম স্মৃতি। স্মৃতি সতত সুখের নয়। সেদিন প্রথম দর্শনে বাজার ভাল লাগেনি, আজও লাগেনা। কিন্তু খেতে গেলে হয় বাজারে যেতে হয় নয়ত নিজে চাষবাস করতে হয়।

এটাই হল সমস্যা। আর এটাই হল অর্থনীতির একটি মূল নীতি - শ্রমের বিভাজন করলে উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আবশ্যক। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবাই নিজে নিজে না করে, বিভিন্ন কাজে যোগ্যতা বা দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন লোক নিয়োজিত হলে, সামগ্রিক ভাবে অধিকতর পরিমাণে বা উন্নততর মানের পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হবে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সবাই লাভবান হবে। এখন শ্রমের বিভাজনের সাথে বাজারের বিনিময়ের কোন আবশ্যক সম্পর্ক নেই, উদাহরণ হিসেবে বর্ণাশ্রম বা দাস প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে। বাজারের বিনিময়ের প্রধান দুটি শর্ত হল ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার এবং যে কোনো লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার স্বেচ্ছায়, অবহিত এবং সচেতনভাবে অংশগ্রহণ। [iv]

শুধু তাইনা, আধুনিক সমাজে যেখানে জনসংখ্যা প্রচুর, কখন কার কিসের প্রয়োজন আর কখন কে কোনটা সরবরাহ করতে পারবে এর সমন্বয় সাধনের সমস্যাটার জন্যে যে তথ্যের এবং তথ্যবিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা কোন নশ্বর পরিকল্পকের সাধ্যের অতীত (প্রশাসনিক ত্রুটি, দীর্ঘসূত্রিতা বা দুর্নীতি এসবের

কথা যদি বাদও দিই) । পরিকল্পিত অর্থনীতির ইতিহাসের শিক্ষাও তাই বলে। তার মানে সব বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া না । কে কোন রাস্তায় কখন কোথায় যাবে, তার জন্যে যদি কোন সংস্থার কাছে আবেদন পেশ করতে হত, এবং সেই সংস্থার কাজ হত যদি পুরো ব্যাপারটা সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা, কি হত ভাবুন! তাই ব্যাপারটা খানিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও তাতে মাঝে মাঝে যানজট হবে না, তা না । তবে তাই বলে পুরোপুরি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দিলে চরম বিশৃঙ্খলা হবে - তাই ট্রাফিক সিগনাল বা পুলিশের অবশ্যই দরকার । সেই রকম বাজারের ক্ষেত্রে জিনিসের দাম খানিকটা ট্রাফিক সিগনালের মত কাজ করে । যদি জানি মাছের দাম বেড়েছে (লাল আলো), তাহলে জানি কোন কারণে যোগান কম, কেন তা জানার দরকার নেই, ডিম কিনে বাড়ি ফিরি (সবুজ আলো)। কিন্তু সবাই ডিম কিনতে গেলে ডিমের দাম বাড়বে (লাল আলো) কিন্তু ডিমের যোগান বাড়বে কারণ মুনাফা বেশি (সবুজ আলো) । অগণিত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে তথ্য ও সিদ্ধান্তেরর এই বিকেন্দ্রীকরণ হল বাজারের একটা বড় গুণ - অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় যেন অদৃশ্য কোন হাত দিয়ে সবাই চালিত হচ্ছে । আর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ট্রাফিক পুলিশের কাজ করে, এ প্রসঙ্গে পরে আসছি । তার মানে এই নয় যে কখনো কখনো এই ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়না এমনকি মুমূর্ষু অবস্থা হয়না, এবং তখন অবশ্যই সরকারি হস্তক্ষেপের কড়া দাওয়াই প্রয়োজন হয় । কিন্তু ছোটখাটো অসুখ বিসুখ যেমন আমাদের শরীর নিজেই মোকাবিলা করে নিতে পারে, অস্ত্রোপচারের দরকার হয়না, এ ক্ষেত্রেও তাই ।

বাজারের আরেকটা গুণ হল একদিক থেকে দেখলে বাজার খুব গণতান্ত্রিক - সেখানে ভোট দেবার অবাধ অধিকার, যদিও মানুষের নয়, কড়ির । পকেটে পয়সা থাকলে সব জায়গায় অবারিত দ্বার । বর্ণাশ্রম প্রথার কথা নয় বাদই দিলাম, কলকাতারই নানা অভিজাত ক্লাব থেকে শুরু করে রাজনীতি, ব্যবসা, প্রশাসন, শিল্প-সাহিত্যের জগতে এটা সম্ভব নয় - চেনা জানা থাকতে হবে ।

তাই পারিবারিক পরিচয়ের এত মূল্য - বাংলা ভাষায় স্বনামধন্য কথাটা আছে কেন, নিশ্চয়ই পরনামধন্যও হওয়া যায় বলে! সাধে কি আর সুকুমার রায় লিখেছিলেন, "কিন্তু তাঁরা উচ্চ ঘর, কংস রাজের বংশধর," বা, "আদ্যনাথের নাম শোনোনি, খগেন কে তো চেনো ? শ্যাম বাগচি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো । " টাকা যেমন এক মুদ্রা থেকে আরেক মুদ্রায় সহজেই পাল্টে নেওয়া যায়, চেনাজানার মুদ্রা কিন্তু একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই চলে, অর্থনীতির ভাষায় প্রবেশের পথে অনেক অন্তরায় (entry barriers) আছে । অচেনা কোন শহরে গিয়ে পড়লে সব সময়েই ধাবা বা চায়ের দোকানে আপনি জলখাবারটা পেয়ে যাবেন । কাউকে ধরাধরি করতে হবেনা, চেনাজানা থাকতে হবেনা বা আপনার জাত বা সম্প্রদায় কি কেউ জিজ্ঞেস করবেনা । অ্যাডাম স্মিথের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে - আমাদের নৈশাহারের জন্যে কশাই বা মুদীর দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়না, তারা নিজের তাগিদেই যোগান দেয় ।

বাজার ব্যবস্থার প্রসার তাই কিছু সামাজিক কুপ্রথা দূর হবার সহায় হতে পারে । যেমন ধরা যাক বর্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা । সমাজের চোখে কেউ অন্ত্যজ হতে পারেন, কিন্তু বাজারের উপস্থিতিতে তাঁর মূল্যায়ন হবে তাঁর মেধা বা উৎপাদিকাশক্তি অনুযায়ী। একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী একজন কৃষ্ণাঙ্গ কারিগর বা শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ না করতে পারেন বা তাঁর সাথে সামাজিক ভাবে মেলামেশা না করতে পারেন, কিন্তু তাঁর তৈরি পণ্য যদি বাজারে ভালো দামে বিক্রী হয়, তাহলে মুনাফার লোভে তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে রাজি হবেন, এই জেনে যে তিনি না করলে অন্য কোন প্রতিযোগী ব্যবসায়ী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে । প্রতিযোগিতার জায়গায় একচেটিয়া আধিপত্য থাকলে অবশ্য এই প্রবণতা কম হবে । মুক্তবাজারপন্থী অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার দেখান যে বাজারে প্রতিযোগিতার চাপ যত থাকবে, আস্তে আস্তে বর্ণ বৈষম্যের ফলে যে অর্থনৈতিক অসাম্য তা তত কমবে । সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রে দেখান হয়েছে যে ভারতে আর্থিক উদারীকরণের পরে

তথাকথিত নিম্ন জাতির মেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় ইংরেজি শিখছে এবং ইংরেজি জানার জন্যে চাকরির বাজারে যে আর্থিক সুবিধা, যা ১৯৮০-র তুলনায় ১৯90 এর দশকে এবং ২০০০-এর দশকের গোড়ায় অনেকটা বাড়ে, তার থেকে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে, অন্য জাতির মেয়েদের তুলনায় এবং একই জাতির ছেলেদের তুলনায় ।[v] অন্য নানা গবেষণাতেও দেখা যাচ্ছে যে চাকরির সংখ্যা এবং শিক্ষিত হবার বাজার দর বাড়ায় দলিত শ্রেণীর আর্থিক ও শিক্ষাগত অবস্থার আগের থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে - অন্য শ্রেণীর তুলনায় গড় মজুরির হারে ১৯৮৪ সালে ব্যবধান ছিল ৩৬%, এখন তা কমে হয়েছে ২১% ।[vi]

তবে যেখানে আদিগন্ত অসাম্য ও দারিদ্র্য, শ্রম যেখানে পুঁজির তুলনায় অপর্যাপ্ত সেখানে অবশ্য বাজারের গণতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের (elite rule) কোন তফাৎ নেই । বাজারের যুক্তি ফেল কড়ি মাখো তেল, তাই কড়ি যার বাজার তারই । অসম সমাজে অর্থই হল ক্ষমতার উৎস, সামন্ততন্ত্রে যেমন বংশপরিচয় । সংবাদমাধ্যমে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হবে মাথা ব্যথা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রকোপেই ধরণী কম্পমান, এর চেয়ে বড় কোন স্বাস্থ্য সমস্যা নেই, যেখানে ম্যালেরিয়া বা আন্ত্রিক অসুখে বিনা চিকিৎসায় প্রতি বছর সারা পৃথিবী জুড়ে পঞ্চাশ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয় যা অনিবার্য নয় । যতই হোক, গরীবরা তো আর ক্রেতা নয় ! তাই দক্ষতার দিক থেকে বাজার ব্যবস্থার কিছু গুণ অনস্বীকার্য, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজারের ধাক্কায় সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায় (justice) বা সাম্যের (equality) দিক থেকে তার সমস্যার কথা অস্বীকার করা শক্ত । কিন্তু মিল্টন ফ্রিডম্যানের মত মারকুটে মারকেটপন্থী দের কাছে বাজারের মূল আকর্ষণ হল বেছে নেবার স্বাধীনতা ("free to choose") । এই স্বাধীনতার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে । এটা ঠিকই বাজারে ক্রেতার স্বাধীনতা আছে এক দোকানে না গিয়ে অন্য দোকানে যাওয়া, বা এক কোম্পানির জিনিস না কিনে আরেক কোম্পানির জিনিস কেনা । পাঠকের অধিকার আছে প্রবন্ধের বই কেনা বা চটুল প্রেমের মুখরোচক উপন্যাস কেনার ।

শ্রমিকের অধিকার আছে এক জায়গায় না পোষালে আরেক জায়গায় চাকরি করা। বাস বা ট্যাক্সি মালিকের স্বাধীনতা আছে জ্বালানির দামে না পোষালে এবং ভাড়া বাড়াতে না দিলে গাড়ি না চালানোর। কিন্তু স্বাধীনতা আসলে কতটা তাতো বিকল্পের ওপর নির্ভর করছে। জন রোমারের মত বামপন্থী অর্থনীতিবিদের মতে দরিদ্রের কাছে বাজার যা দেয় তা হল হেরে যাবার স্বাধীনতা ("free to lose")। কাজের জায়গায় না পোষালে অন্য চাকরি করা বা চালের দাম বাড়লে আটা কেনা বিকল্প না, বিকল্প হল অভুক্ত থাকা। এই বিকল্পের অভাব এবং অভাবের দায় বাজার অর্থনীতির সমর্থনে, বিশেষত সামাজিক কল্যাণের (social welfare) দিক থেকে তার ফলাফলের মূল্যায়নে, যে কথাগুলো সচরাচর বলা হয়, তার বিরুদ্ধে একটা বড় যুক্তি। স্বেচ্ছায় কিছু করা আর বাধ্যবাধকতা থেকে করা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, যেটা বাজার-পন্থীরা অনেক সময় মিশিয়ে ফেলেন। তাঁরা বলতেই পারেন, অনেক অসাম্য বাজার-অর্থনীতির আগে থেকেই ছিল, এবং সেটা নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল। এও বলতে পারেন, কম মজুরিতে এবং খারাপ কাজের পরিবেশে কাজ করাটা ভালো নয়, কিন্তু তাই বলে শ্রমের বাজার বন্ধ করে দিলে এই মানুষগুলির বিকল্প আরও কমে যাবে, ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবেনা। আবার এও বলতে পারেন, কম মজুরির আকর্ষণে বিনিয়োগ বাড়বে, পুঁজি ও শ্রমের যে সমতার অভাবে মজুরি এত কম, এই প্রক্রিয়ায় সময়ের সাথে সাথে মজুরিও বাড়বে। কিন্তু তাঁরা যেটা বলতে পারেননা, সেটা হল সম্পদের এই বণ্টন ন্যায্য এবং তাই বাজার মেধাতন্ত্র (meritocracy) প্রতিষ্ঠার সহায়ক। এর মধ্যে যে বিশ্বাস লুকিয়ে আছে তা হল, কারুর আয় বা ধনসম্পদ একমাত্র তার নিজের চেষ্টা, পরিশ্রম ও মেধার ফল, তাই কেউ যদি দরিদ্র হয়, তার জন্যে সেই দায়ী। পুনর্বণ্টনের অর্থ তাদের কাছে সাফল্যকে শাস্তি দেওয়া এবং ব্যর্থতাকে পুরস্কৃত করা, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল উদ্যম এবং পরিশ্রম কমা, এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মন্থর হওয়া। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা

শুনলে আশ্চর্য লাগার কথা - একজন দিনমজুরের থেকে পরিশ্রম কে বেশি করে, আর সুযোগ পেলে সে বা তার সন্তান মেধার জোরে কোথায় যেতে পারত তা আমরা জানিনা! এই কারণেই আমাদের মত অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবিরা খানিক বামঘেঁষা হন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে উদারপন্থী (libertarian) চিন্তাধারায় এই কথা অনেকেই মনে করেন (যেমন, অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দক্ষিনপন্থী পদপ্রার্থী মিট রমনি এই মরমে একটি বেফাঁস উক্তি করে মুশকিলে পড়েছেন)। রেসের দৌড়ে কেউ যদি প্রথম থেকে এগিয়ে থাকে, সে জিতলে তাকে আর যাই হোক মেধার বা পরিশ্রমের জয় বলা যায়না।

আবার এটাও ঠিক, সমান সুযোগ পেয়ে যদি কোন ছাত্র তার সহপাঠীর থেকে অনেক বেশি সফল হয়, তখন এই আপাত-অসাম্য কে অতটা অন্যায্য মনে হয়না। প্রশ্নটা তাই সুযোগের সমানাধিকার, ফলাফলের নয়। তবে এই সুযোগের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। সরকারি নীতি দিয়ে আর্থিক বা শিক্ষার সুযোগ সমান করার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ? যার মা বাবা অর্থনীতিক থেকে একই রকম অবস্থার আরেকজনের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত সে বাড়িতে যে পড়াশুনোর পরিবেশ পাবে (বংশগতির কথা না হয় বাদই দিলাম), সেই অসাম্য কিভাবে দূর করা যাবে? এই অসাম্য নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু সমাজে সবাই যেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত ব্যাপারে ন্যূনতম সুযোগ পায় - তার পদ্ধতি যাই হোকনা কেন - এটা আশা করি সবাই মেনে নেবেন।

আরও কতগুলো কথা এখানে ভেবে দেখা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দক্ষতা, সাম্য বা ন্যায়, এবং স্বাধীনতা নিয়ে এই টানাপোড়েনগুলি শুধু বাজার ব্যবস্থা নয়, সম্পদ বণ্টনের (resource allocation) যে কোন বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও খাটে। বাজারের একটা বড় সমালোচনা হল প্রয়োজন নয়, আর্থিক ক্ষমতাই হল সম্পদ বণ্টনের মূল চালিকা শক্তি। "অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব - অথবা যা নিলেমের নয় সে সব জিনিস

বহুকে বঞ্চিত করে দু-জন কি একজন কিনে নিতে পারে ।” ধরা যাক আপনাকে হঠাৎ দিল্লি যেতে হবে, কিন্তু বিমানবন্দরে বা রেল স্টেশনে গিয়ে দেখলেন যোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি, তাই বিশাল লাইন । বাজারের যুক্তি অনুযায়ী যে বেশি দর হাঁকতে পারবে, সেই অগ্রাধিকার পাবে । তা না করে যদি সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে হয় তাতে সবার সময়ের অপচয় হবে, তার একটা মূল্য আছে এবং যেহেতু সবার জন্যে যথেষ্ট স্থান নেই, সব চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি, সে স্থান নাই পেতে পারে । এই ধরণের পরিস্থিতিতে যেটা বাস্তবে হয় সেটা হল যোগাযোগ বা রাজনৈতিক চাপ বা গলার জোর ব্যবহার করে অগ্রাধিকার পাওয়া । আর্থিক ক্ষমতা, লাইনে দাঁড়াবার ক্ষমতা, যোগাযোগ বা গলার জোরের কোনটার সাথেই প্রয়োজনের কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই । সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে দেখলে, যেকোন পণ্য, সেবা বা সম্পদ যখন চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, তখন অর্থনৈতিক দক্ষতা বা ন্যায় দুই থেকেই প্রয়োজনের মানদণ্ডে তার বণ্টন নির্ধারিত হওয়া উচিৎ । কিন্তু বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনের মাত্রা বিভিন্ন হলে এবং প্রয়োজন মাপার উপায় না থাকলে, এই বণ্টনের সমস্যাটা কঠিন সমস্যা । জিজ্ঞেস করলে তো সবাই বলবে আমার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি । যার প্রয়োজন বেশি সেই সব চেয়ে বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত হবে, এই হল বাজার-পন্থী দের যুক্তি, কিন্তু সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে যদি খুব একটা অসাম্য না থাকে, তাহলেই একমাত্র সেটা প্রযোজ্য । কিন্তু বাজার ব্যবস্থা না ব্যবহার করে অন্য যে কোন ব্যবস্থা করলেও সমস্যাটা কিন্তু চলে যাচ্ছেনা। শুধু তাইনা, যোগানের অভাব, যা হল মূল সমস্যার সূত্র, তার একমাত্র সমাধান হল যোগান বৃদ্ধি, কিন্তু দাম না বাড়লে বা মুনাফা না বাড়লে যোগান কেন বাড়বে? এই মুহূর্তে রাজ্যে বাস এবং ট্যাক্সি চালক দের দাম বাড়ান নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, এই যুক্তিটি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

তা ছাড়া, যে কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা না হলে তত্ত্ব ও প্রয়োগে আকাশপাতাল তফাৎ রয়ে

যাবে । ফুটবল খেলা ভালবাসি, কিন্তু খেলার মাঠে রেফারী না থাকলে খেলার বদলে মারামারিই হবে শুধু (থাকা সত্ত্বেও হয় মাঝেমাঝে), আর তার জন্যে খেলাটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেই রকম গণতন্ত্রের সমর্থক আমরা (প্রায়) সবাই। কিন্তু আমাদের দেশে যে ভাবে ভোট কেনা বেচা বা জোরজবরদস্তি, জনমোহিনী নীতির দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রয়োগ, নির্বাচনে কারচুপি সবকিছুই হয়। তার জন্যে কি আমরা গণতন্ত্রের নীতি কে দোষ দেব না বলব ের থেকে একনায়কতন্ত্র ভালো ? নির্বাচনী কমিশনের সক্রিয় ভূমিকায় আগের থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে, আশা করা যায় আরও হবে । তা ছাড়াও বিচার ব্যবস্থা, সংবাদ মাধ্যম, তথ্যের অধিকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ফারাক কমাতে । বাজারের ক্ষেত্রেও সেরকম সরকারের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় রাখা, আইন-ব্যবস্থা এবং নানা নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আদানপ্রদানে নানা ভাবে মধ্যস্থতা করা এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন বলবত করা (যেমন, পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক লেনদেনে চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । ভূমিকা আছে সংবাদ মাধ্যম, এবং নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (যেমন, ক্রেতার বা শ্রমিকের অধিকার নিয়ে এনজিও, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার) । ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বাজার অর্থনীতির এক আবশ্যক শর্ত । তাই দরিদ্র কৃষক বা আদিবাসী দের যখন অনেকসময় ছলেবলে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয় তার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতাও দায়ী, শুধু বাজার ব্যবস্থা কে দোষ দেওয়া যায়না । আর অনেক সময়েই আমরা খেয়াল রাখিনা, এই জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া স্বাধীন ভারতে শুরু হয় নেহরুরর আমলে, বড় বড় পরিকাঠামো তৈরির প্রকল্পের সময়, নয়া-উদারবাদের জমানায় নয় ।

এই সমস্যাগুলি যদি নাও থাকে, উপাদান (input) আর উৎপাদনের (output) যে অমোঘ সম্পর্ক তার থেকে মুক্তি কোথায়? রান্নার উপকরণ ভালো না হলে রান্নার

মান তো ভালো হবেনা, রাঁধুনি যেই হোকনা কেন। বাজার ব্যবস্থা একটা যন্ত্রের মত - তাতে যা ঢোকানো হবে, বাজার ব্যাবস্থা তার নিজস্ব প্রক্রিয়াবলে তাকে পণ্যে রূপান্তরিত করবে। দারিদ্র্য, অসাম্য, নানা রকম সামাজিক বৈষম্য এবং অনগ্রসর নানা চিন্তা ও মূল্যবোধ যদি মূল উপাদান হয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাই হোক, তাদের ফলাফল কোন জাদুমন্ত্রে এই উপাদান গুলির প্রভাবমুক্ত হতে পারেনা। যে সমাজে নারীকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়না, সেই সমাজে পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বা সম্পত্তির অধিকার কোন জায়গাতেই খুব প্রগতিশীল ফলাফল আশা করার মানে হয়না, বা তার জন্যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা আইনি ব্যবস্থাকে দোষ পেড়ে লাভ নেই। আবার সাহেবদের যত বর্ণবৈষম্য নিয়ে খোঁটা দিই না কেন, ফর্সা গায়ের রঙের প্রতি যদি আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনায় প্রবল আকর্ষণ থাকে ("কালো হাত", "কালো টাকা" কালো বাজার"), তাহলে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি (বা হ্যান্ডসাম) ক্রিমের বিক্রী তো হবেই হইহই করে, তাতে বাজারের দোষ কি। সেই রকম যে সমাজে ঐতিহাসিক ভাবে সমাজের একটা বড় অংশ প্রান্তিক গোষ্ঠী বা দরিদ্র এবং দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, বাজার ব্যবস্থায় তাদের মজুরি বেশি হবেনা, এবং শুধু তাইনা তাদের উপস্থিতি অন্যান্য শ্রেণীর মজুরির ওপরেও নিম্নমুখী চাপ দেবে, এটাই স্বাভাবিক। বৈষম্য থেকে বৈষম্যই তৈরি হয়, বাজার ব্যবস্থা তাকে বর্ধিত বা তরান্বিত করতে পারে, কিন্তু সবসময় তার মূল কারণ নাও হতে পারে। আবার ঐতিহাসিক কারণে যদি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কম হয়, তাহলে বাজার ব্যবস্থার ফলাফল নিয়ে নৈতিক আপত্তির জায়গা কম। উদাহরণ হিসেবে শিশু শ্রমকে নেওয়া যাক। এই প্রথা কোনভাবেই সমর্থনীয় নয় - সাম্য, ন্যায় এবং স্বাধীনতা তো বটেই, এমনকি অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক থেকেও নয়, কারণ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে যা শিশু শ্রম প্রথায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে। এই প্রথা আছে কেননা দরিদ্র মা-বাবা সাধ্যের বা সচেতনতার অভাবে

তাঁদের শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে যথোচিত বিনিয়োগ করতে পারেননা। কিন্তু এই প্রথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও ছিল এবং এটি আইন করে বন্ধ করে দিলে, এর পেছনের যে মূল কারণ, দারিদ্র্য বা অসাম্য, সেগুলো চলে যাবেনা, এবং এই শিশুদেরও যে অবস্থার উন্নতি হবে আমরা তা বলতে পারিনা। যা হবে তা হল অসুখের চিকিৎসা নয় উপসর্গ দমন । আবার অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে পড়াশুনোর ফাঁকে অপ্রাপ্তবয়স্কেরা নানা ধরণের কাজ করে তাদের হাতখরচ যোগাড় করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক আপত্তি করার কিছু নেই কারণ সেখানে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার থেকে ইচ্ছের ভূমিকা বেশি। তাই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট না জেনে, বাজারের ভূমিকার মূল্যায়ন করা মুশকিল। আরেকটি উদাহরণ হল শ্রমিকদের অধিকার। আমাদের দেশে শ্রমিকেরা যে মজুরিতে এবং যে পরিবেশে কাজ করেন (যেমন, ছুটি, শারীরিক নিরাপত্তা, পেনশন), বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে, তা সত্যি লজ্জার বিষয় এবং ভারত জ্বলজ্বল করছে বলে যারা গর্ব করেন তাদের বিশেষ করে অবহিত হওয়া উচিৎ। বেশি দূর গিয়ে সমীক্ষা করে দেখতে হবেনা, শিক্ষিত চাকুরীজীবি মানুষেরা নিজেরা কাজের জায়গায় নানা ধরণের অধিকার ভোগ করায় অভ্যস্ত, তাঁরাই যদি ভেবে দেখেন যে তাঁদেরই গৃহকর্মচারীরা কি ধরণের মজুরিতে কাজ করেন এবং কিরকম সুযোগসুবিধে পান, তাহলেই আন্দাজ পাবেন। কিন্তু আইন করে (যেমন, ন্যূনতম মজুরি) এর সমাধান কঠিন, কারণ আমাদের দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমের (surplus labour) কারণে পেটের দায়ে শ্রমিকদের পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতাতেই মজুরি এবং অন্য সুযোগসুবিধে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। একে বলা যেতে পারে “নিম্নমুখী দৌড়” (race to the bottom) । আইন থাকলেও পেটের দায় বড় দায়, আইনের প্রয়োগ নিয়ে সমস্যা বা রাজনীতিক-প্রশাসক-ব্যবসায়ীদের আঁতাতের কথা যদি বাদও দিই, কে গিয়ে নালিশ করবে? আবার আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত দেশ, যেখানে শ্রমের চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশি, এবং যেখানে অর্থনীতি অভিবাসী

শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে, সেখানে আইন ব্যাতিরেকেই শ্রমিকদের আকর্ষণ করার জন্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো মজুরি বা অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হয়। আবার দেখা যাচ্ছে, বাজার ব্যবস্থার ফলাফল নির্ভর করছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপরে । কোনটা কারণ কোনটা ফল সেটা নিয়ে পরিষ্কার থাকা ভালো । অসাম্যের জন্যে বাজারের ওপর সব দোষ না চাপিয়ে বা উপসর্গের সাথে রোগের মূল কারণ কে গুলিয়ে না ফেলে অসাম্যের উৎস দেখতে হবে এবং তার চিকিৎসা করার কথা ভাবতে হবে, বাজার নামক জুজুকে তাড়াবার চেষ্টায় মেতে উঠলে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, রোগীর রোগ কিন্তু সারবেনা।

বাজারের অদৃশ্য হাত, সরকারের বজ্রমুষ্টি

বাজারের মধ্যে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল ব্যাপার আছে । কখন দাম বাড়ে কখন দাম পড়ে, কখন মন্দা আসে কখন বাজার গরম, কখন নতুন কোন জিনিস বাজারে এসে পুরনো জিনিস কে হঠিয়ে দেয়, কোন ব্যবসা রমরমিয়ে চলে, কারোর ব্যবসা লাটে ওঠে, কখন কে কাউকে ঠকায়, কখন কেউ কারোর বিপন্নতার সুযোগ নেয়, কোন ঠিক নেই । যদি কোন সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বকল্যাণকামী পরিকল্পনাকার থাকতেন এবং সব কিছুর দায়িত্ব নিতেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু নেই। শুধু তাই না, ইতিহাসের শিক্ষা হল যে যে সমাজ এই আশায় কোন ব্যক্তি বা দলকে অপরিমিত শক্তি দিয়েছে, ফল ভালো হয়নি। তাই হাজার খুঁত সত্ত্বেও এই মুহূর্তে হাতে রয়েছে গণতন্ত্র এবং মিশ্র অর্থনীতি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান।

কিন্তু এই মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের সীমা রেখা কোথায়? কোথায় নিয়ন্ত্রণরেখা টানা হবে মুক্তবিনিময়ের প্রাঙ্গনে? মাদক-দ্রব্য, গণিকাবৃত্তি, স্বেচ্ছা দাসত্ব, থেকে শুরু করে মানবশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন, কিডনি) কেনাবেচা কোনটা আইনসম্মত করা উচিৎ, কোনটা না এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, সে নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনায় এখানে ঢুকছিনা।[vii] কিন্তু একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুক্তবাজারের সমর্থকেরা অনেক সময় স্বেচ্ছা বিনিময়য়ের যুক্তি ব্যাবহার করে বলেন ক্রেতা-বিক্রেতা রাজি তো কেয়া করেগা কাজী। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার এবং যে কোনো লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ এই দুটি শর্ত পালিত হলে আর তৃতীয় ব্যক্তির সে ব্যাপারে বলার কিছু থাকতে পারেনা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, এই ধরণের বিনিময় কেউ পেটের দায়ে বা বাধ্য হয়ে করছেননা। এও ধরে নেওয়া যাক যে পরিবেশ দূষণের মত, ক্রেতা বিক্রেতার লেনদেনে তৃতীয় কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হচ্ছেননা। কিন্তু এই যুক্তি তে কি আমরা ভোট কেনাবেচা সমর্থন করতে পারি?[viii] হতে পারে আমার কাছে ভোট দেওয়াটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি যদি অর্থের বিনিময়ে আমার এই অধিকার বেচে দিই তাহলে শেষপর্যন্ত গণতন্ত্র বলে কিছু বাকি থাকবেনা। কেউ কেউ অনেক ভোট কিনে নিয়ে ক্ষমতায় এসে তাদের ইচ্ছে মত আইন পাশ করবেন। তাতে বাজারব্যবস্থার যে গুণগুলির কথা তার সমর্থকরা সচরাচর বলেন, যেমন প্রতিযোগিতার ফলে অর্থনৈতিক দক্ষতার বৃদ্ধি সেগুলিও টিকবেনা, কারণ কিছু ব্যবসায়ীর হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা এলে তারা চিরতরে তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা কায়েম করে বসবে। তাই উগ্র-উদারবাদী চিন্তার গোড়ায় একটা গলদ আছে। সব কিছু কেনা বেচার অধিকার চালু করলে তা বাজার ব্যবস্থার পক্ষেই আত্মঘাতী হবে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানেই বাজারের দাম আর সামাজিক মূল্যের মধ্যে ফারাক থাকে যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, সেখানে বাজারের মুনাফার প্রতি আনুগত্য সামাজিক কল্যাণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু জিনিসকে যে কোন সমাজে যে কোন অবস্থাতেই বাজারের লেনদেনের আওতার বাইরে রাখা ভালো।[ix] মুক্ত অর্থনীতির পীঠস্থান বলে সচরাচর যে দেশকে ধরা হয়, অর্থাৎ আমেরিকাতে বেসরকারি কিন্তু অলাভ-মুখী (non-profit) প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান জাতীয় আয়ে প্রায়

৮% এবং কর্মসংস্থানে প্রায় ১২% । বেসরকারি ক্ষেত্র আর বাজার তাই সমার্থক নয় ।

আবার বাজারের বিরোধীরা আবার অনেক সময় বাজার ব্যবস্থার সাথে কোন আদর্শ ব্যবস্থার তুলনা করে সমালোচনা করেন । কিন্তু আর সব কিছুর মতই বাস্তব আর আদর্শের অনেক তফাৎ, আমরা বাঁচি বাস্তবে আর কল্পনা করি আদর্শে । তুলনা তাই কতগুলি ত্রুটিসম্পন্ন বিকল্পের মধ্যে, যাদের সবারই কিছু ভালো মন্দ আছে। মাদকসেবন খারাপ । কিন্তু তাকে বেআইনি করলে তা জাদুমন্ত্রে উবে যাবেনা । আইনি নিয়ন্ত্রণের ফাঁকফোকর দিয়ে গোপনে তার ব্যবসা চলবে, যেমন চলে বাস্তবে । তাতে ভেজাল, মাফিয়া দের রমরমা, খুন-খারাপি সব চলবে। আবার তাকে পুরোপুরি আইনি করলে যোগান বেড়ে যাবে (যদিও তাকে করের আওতায় আনা যাবে) আর তার ব্যবহারও বাড়বে । সেই রকম ক্ষুদ্রঋণের (microfinance) ক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশে ধার শোধের চাপে কৃষকদের আত্মহত্যার খবর আমাদের বিচলিত করে, কিন্তু এই সমস্যা ক্ষুদ্রঋণ ব্যাবস্থা চালু হবার আগেও ছিল এবং তাকে আইন করে বন্ধ করে দিলেও চলে যাবেনা, বরং গ্রামের মহাজনের ক্ষমতা বাড়বে । আবার বাজারের ফলে যে বিকেন্দ্রীকরণ হয় তার জন্যে অনেকেই উপকৃত হন, সবসময় যে সেটা তাঁরা মনে রাখেন তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবনতি নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে, যে ক্ষেত্রগুলিতে এখনও নিত্যনতুন উদ্যমে দেশ-বিদেশে বাঙালির খ্যাতি তা হল শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ও সঙ্গীত । এগুলি কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত উদ্যমে এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে। এগুলি যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলত কি হত ভাবতে পারেন? সরকারি বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যে সৃজনশীলতা এবং উদ্যমের পরিপন্থী তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই । কমলকুমার মজুমদার, ঋত্বিক ঘটক, বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সরকারি অনুমোদনের আবেদনকারী হিসেবে কল্পনা করে দেখা মুশকিল! তবে এও ঠিক, কোন

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও যদি এই ব্যাপারে একচেটিয়া আধিপত্য থাকে, তাহলে তার ফলও ভালো হবেনা, মুনাফা সৃজনশীলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

উপসংহার

অনর্থনীতির মূল কথা তাই বিকল্প বাড়ান । আর বিকল্পের সংখ্যা বাড়ানোতে প্রতিযোগিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রতিযোগিতার জন্যে চাই সুযোগের সমানাধিকার। প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয় যদি প্রবেশের পথে অন্তরায় থাকে। তখন একচেটিয়া বিক্রেতা ক্রেতার সাথে, নিয়োগকর্তা শ্রমিকের সাথে, বা ক্রেতা যোগানদারের সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। উদারপন্থী অর্থনীতিবিদেরা সরকারি নানা নিয়ন্ত্রণ কে এর জন্যে দায়ী করেন (যেমন, এই মুহূর্তে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে যে বিতর্ক চলছে) । কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, দারিদ্র্য-বঞ্চনাও তো সুযোগের অসাম্য তৈরি করে, এবং নানা পেশা বা ব্যবসা বানিজ্যের জগতে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিযোগিতা বা বিকল্পের সংখ্যা বাড়বে কি করে? এর একটা উত্তর হল শ্রমের তুলনায় পুঁজির যোগান যখন বাড়বে - যখন শ্রমিকরা চাকরি না, চাকরি শ্রমিকদের ধাওয়া করবে। এ হল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী ফল। আজ যদি আমাদের দেশে সব শিশু শিক্ষার, স্বাস্থ্যের সমান সুযোগ পেত, ভবিষ্যতে তাদের অনেকে সফল হয়ে নতুন ব্যবসা বা শিল্প খুলত, দক্ষ শ্রমের বাজারে যোগান বাড়াত, তাতে প্রতিযোগিতা বাড়ত, উৎপাদিকা শক্তি বাড়ত, ক্রেতা, শ্রমিক সবাই তার থেকে উপকৃত হত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে মানব সম্পদের উন্নয়নও খানিকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্বল্পমেয়াদী সরকারি নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে অসাম্য হ্রাস করা এবং একই সাথে দরিদ্র মানুষের বিকল্পের সংখ্যা বাড়ান। প্রথমটির উদাহরণ হল ভুমি সংস্কার, বা নানা রকম দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প যাতে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ অর্থ বা কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বণ্টন করা হয় (যেমন রেশনের দোকানের

মাধ্যমে খাদ্য, বিহারে স্কুলে যাওয়া বালিকাদের জন্যে সাইকেল) । আবার জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা যোজনা (National Rural Employment Guarantee Scheme) এই দুটি নীতির মিশ্র রূপ । এই প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে বছরে সরকারের তরফ থেকে একশ দিনের জন্যে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় । এর ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়ে, এবং বাজারেও মজুরির ওপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ পড়ে। সেই জন্যে কিছু রাজ্যে সফল হলেও কিছু রাজ্যে (এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও আছে) যাঁরা শ্রমিক নিয়োগ করেন সেই কৃষকদের তরফ থেকে এই প্রকল্পের রূপায়ণে বাধা এসেছে । আর প্রয়োজন সুরক্ষা যাতে দরিদ্র মানুষ গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন । জমি অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে এই ব্যাপারে কোন সংশয় দেখা দিলে তার কি ফল হতে পারে। সামাজিক সুরক্ষার যে ব্যবস্থা ধনী দেশে আছে আমাদের দেশে তা আশু প্রয়োজন । এর জন্যে যে আর্থিক সম্বল দরকার, তার জন্যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ছাড়াও সরকারি আয়ের অনেক অযৌক্তিক অপচয় (যার অনেকটা তুলনায় স্বচ্ছল শ্রেণী, যেমন বড় ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক, এবং সরকারি চাকুরীজীবিরা ভোগ করেন) বন্ধ করতে হবে। বিকল্প বাড়ানোর জন্যে প্রযুক্তিরও ভূমিকা আছে যেমন, তথ্যের বিকেন্দ্রীকরণে । ভারতের নানা কোণে মোবাইল ফোনের যে নিরুচ্চার (বা, সোচ্চার) বিপ্লব হয়ে গেছে তার জন্যে একাধিক গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষও উপকৃত হয়েছেন, যেমন বিভিন্ন বাজারে দাম তাঁরা নিজেরাই জেনে নিতে পারছেন, দালালদের ওপর নির্ভরতা কমছে । [x]

বিকল্পই স্বাধীনতা দেয় মানুষকে এবং উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হল সেই স্বাধীনতার সীমার ক্রমবিকাশ । তুলনাটা সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থার মধ্যে নয়, তুলনাটা হল নানা বিকল্পের উপস্থিতির এবং সুযোগের সমানাধিকারের । যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা নীতি বা সংস্কার, তার মূল্যায়ন হোক এই নিক্তিতে । ক্রেতা বা বিক্রেতা, শ্রমিক বা কৃষক, শিল্পী বা উদ্ভাবক যাতে তাঁদের পরিশ্রমের এবং উদ্যমের ন্যায্য মর্যাদা পান এবং কোন লেনদেনে না পোষালে একজন কে

না বলে আরেক জনের কাছে যেতে পারেন, বা প্রয়োজন হলে নিজের উদ্যমে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন কারোর মুখাপেক্ষী না হয়ে । যেকোনো শিশু যেন তার সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে । অর্থাৎ, প্রশ্নটা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের এবং সেই গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসারের । ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যেমন রাজনৈতিক গণতন্ত্র কে শক্তিশালী করে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - এই লেখার বিষয় নিয়ে টিম বেসলি, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জন ডি কুইট, পরীক্ষিৎ ঘোষ, প্রণব বর্ধন, মনীষিতা দাশ, মাধব আনে, সারণ ঘটক, ও সায়ন্তন ঘোষালের সাথে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি । মনীষিতা দাশ প্রতিপদে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন । এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

---

[i] Steven Levitt and Stephen Dubner, *Freakonomics*, William Morrow/HarperCollins, 2005.

[ii] শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য অকাদেমি, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৮।

[iii] “নীলকণ্ঠ”, পরশুরাম গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), এম সি সরকার, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯২ ।

[iv] “The possibility of co-ordination through voluntary cooperation rests on the elementary - yet frequently denied - proposition that both parties to an economic transaction gains from it, *provided the transaction is bi-laterally voluntary and informed*.” Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chapter 1, Chicago: The University of Chicago Press, 1962.

[v] সূত্র : Kaivan Munshi and Mark Rosenzweig (2006): “Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste, Gender, and Schooling Choice in a Globalizing Economy,” *American Economic Review*.

[vi] সূত্র : Amartya Lahiri, Viktoria Hnatkovska and Sourabh B. Paul (2012): "Castes and Labor Mobility (with), *American Economic Journal: Applied Economics.*

[vii] এই নিয়ে আগে কিছু আলোচনা করেছি এই প্রবন্ধটিতে : "দেহ মনের সুদূর পারে : বাজারের সীমা", অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪১৬ । এই বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য বই হল : Why Some Things Should Not be for Sale, Debra Satz, New York: Oxford University Press, 2012 এবং What Money Can't Buy, Michael Sandel, London: Allen Lane, 2012.

[viii] বাস্তবে যে ভোট কেনা বেচা একেবারে হয়না যে তা না, এখানে তর্কের খাতিরে প্রশ্ন হচ্ছে এই বিনিময়কে আইনসম্মত করলে কি হবে।

[ix] এই নিয়ে আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪১৬) আলোচনা করেছি ।

[x] সূত্র : Robert Jensen (2007) : "The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector", The Quarterly Journal of Economics.